নাটকে নায়িকার স্থান পেয়েছে হৈম-র দূরসম্পর্কিত দিদি পুষ্পমালা 'এম, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে।' হাস্যকৌতুকে উজ্জ্বল এই মেয়ের সাদৃশ্য শেষের কবিতা-পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের শহুরে নায়িকাদের সঙ্গে, বাঁশরি সরকারদের সঙ্গে। সে বঙ্কিমের নভেল পড়ে না, কথায়-কথায় রবিঠাকুর কোট্ করে। চতুর্দিকে স্বামীরা ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে দেখে বিব্রত ষষ্ঠীচরণ যখন জজ্ঞাসা করে, 'কনগ্রেসওয়ালারা এর কিছু করে উঠতে পারলে না?' উত্তরে পুষ্প বলে,

> 'মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওয়াজ একেবারে বন্ধ। গলির মোড়ে খুদু ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে—দুদিন বাদেই সিক্ লীভের দরখাস্ত। (৩)

এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের উক্তিকে সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায়—"পুষ্পমালার ন্যায় মেয়ে সমাজে দেখা যায় কিনা জানি না, এক হিসাবে কন্যাটি অতি প্রগলভা—high-brow বা নাক-উঁচু অপবাদও দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন মূল গল্পটি লেখেন সাতচল্লিশ বৎসর পূর্বে তখন এই শ্রেণীর নায়িকার কল্পনা তাঁহার সাহিত্যে দেখা যায় কম। সবুজপত্র-উত্তর পর্ব হইতে এই শ্রেণীর নায়িকা তাঁহার গল্প মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইতেছে। পুষ্পমালা হইতেছে লাবণ্য, কেতকী, সরলাদের সমগোষ্ঠীগত নব্যশিক্ষিতা নারী—এমন কি ইহারা গোরা-র নারীও নহে। কবিজীবনের পরিবেশের পরিবর্তন হইয়াছে—এখনকার নায়িকাদের অনেকেই ধনীকন্যা, ড্রয়িংরুম-বিহারিণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী এমন কি বিলাতফেরৎ রমণী।"[৮] সরল কৌতুকময় পুরোনো গল্পের ঘাড়ে সাতচল্লিশ বছর পরের পরিবেশ থেকে নব্যশিক্ষিত বাক্‌পটু রমণীকে চাপিয়ে দেওয়া খুব সুখের হয় নি। পাড়া-গাঁর পরিবেশে পুষ্প যেমন বে-মানান, এই সরল নাটকের মধ্যেও তেমনি সে বেমানান। মাঝখান থেকে এই চরিত্রের প্রভাবে আগের সাবলীল অকৃত্রিমতা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শুধু পুষ্পের কথায় নয়, তার দেখাদেখি অন্যদের কথায়ও এসেছে এক ধরণের কৃত্রিম স্পার্টনেসের ছোঁয়া। এ ছাড়া সময়ের পরিবর্তনে অনেক সমসাময়িক উল্লেখ-অনুষঙ্গ নাটকে ঢুকেছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক করতে গিয়ে বলদেও-প্রভৃতি নতুন চরিত্র আনতে হয়েছে। কিন্তু যে মাখনলাল গল্পে ছিল ষষ্ঠীচরণের ছেলে, সে নাটকে হঠাৎ কেন ষষ্ঠীচরণের নাতি হয়ে গেল বোঝা যায় না!

১ রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ (প, ব, স) পৃঃ ২১৯
২ রবীন্দ্রজীবনী ২ (বি, ভা) ১৩৬৮, পৃঃ ১৯৮
৩ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (পঞ্চম সং)—নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৩৪
৪ যাত্রী (বিশ্বভারতী) ১৩৫৩, পৃঃ ২৮৪
৫ তদেব, পৃঃ ২৫৬
৬ এই সাদৃশ্য প্রভাতকুমারেরও চোখে পড়েছে। রবীন্দ্রজীবনী ৪, ১৩৬৩, পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য।
৭ ভূমিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী ৬, (প, ব, স) পৃঃ ১২৩৫
৮ রবীন্দ্রজীবনী ৪, ১৩৬৩, পৃঃ ১৪৩

॥ উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর ॥

আমরা রবীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলি নাটক পাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের উপন্যাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে নাটক রচনা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি নাট্যরূপান্তরকালে সমগ্র উপন্যাসকেই ব্যবহার করেছেন—যেমন বউঠাকুরাণীর হাট ও প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসের ক্ষেত্রে। আবার কখনো এইরূপ রূপান্তরের সময় উপন্যাসের অংশবিশেষকে গ্রহণ করেছেন, যেমন রাজর্ষি উপন্যাসের ক্ষেত্রে।

(ক) বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ঃ প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)

বউঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসটির কাহিনী রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ-পরাজয় গ্রন্থ থেকে। এই উপন্যাসটির বিচিত্র নাট্যরূপান্তরের ইতিহাস আছে। উপন্যাস থেকে প্রায়শ্চিত্ত নাটক, তার থেকে এক বিশিষ্টধরণের রূপান্তর মুক্তধারা, অন্যধরণের রূপান্তর পরিত্রাণ। এ ছাড়া, জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরাণীর হাট অবলম্বনে লিখিত কেদারনাথ চৌধুরীর রাজা বসন্ত রায় নাটক জনপ্রিয়তার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সেই পরবর্তী বিবর্তনের ইতিহাসের আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে, রবীন্দ্রনাথ

বউঠাকুরাণীর হাটের বিষয় ও ঘটনাবস্তু কী ভাবে উপন্যাসের রূপ থেকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং সেই আঙ্গিকগত পরিবর্তন বিষয়গত কোনো পরিবর্তন ঘটিয়েছে কিনা, বর্তমানে সেইটিই আমাদের আলোচ্য। বউঠাকুরাণীর হাটের প্রতাপাদিত্য স্বাদেশিকতা-প্রচারের বীর প্রতাপ নয়। জড়তা ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক এই প্রতাপ, সেই দিক থেকে এই প্রতাপ রবীন্দ্রনাথের রাজা ধারণার বিরোধী। এই প্রতাপের পারিবারিক জীবন অবলম্বন করে যে বউঠাকুরাণীর হাট উপন্যাস রচিত হয়েছিল, তার নাট্যীকৃত রূপ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।"[১] কিন্তু 'প্রায় নূতন গ্রন্থের মতো' হলেও অনেক ক্ষেত্রেই যে উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে নাটকের দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য, চতুর্থ পরিচ্ছেদ তৃতীয় দৃশ্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চতুর্থ দৃশ্য এবং সপ্তম পরিচ্ছেদ রূপান্তরিত হয়েছে ২।৩ দৃশ্যে, ঊনবিংশতিতম পরিচ্ছেদ রূপান্তরিত হয়েছে ৩।৫ দৃশ্যে। এই রকম আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দুই বা ততোধিক পরিচ্ছেদকে কখনো-কখনো একটি দৃশ্যে পরিবর্তিত করা হয়েছে। যেমন, নবম ও দশম পরিচ্ছেদ একত্রিত করে ২।৫ দৃশ্য এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদ একত্রিত করে রচিত হয়েছে ৩।৩ দৃশ্য। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ রূপান্তরিত হয়েছে নাটকের প্রথম দৃশ্যে—যেটুকু পরিবর্তন এখানে করা হয়েছে, রুক্মিণী চরিত্র বর্জন তার জন্য দায়ী। পরিচ্ছেদের প্রায়-আনুগত্যে দৃশ্যগুলি রচিত হওয়ার ফলে দৃশ্যগুলি আকারে খুব ছোট হয়েছে।

লালসাময়ী যে রুক্মিণী চরিত্রকে উপন্যাসে আমরা পেয়েছিলাম সেই চরিত্র নাটকে বর্জিত হয়েছে। নাটকে নতুন চরিত্র এসেছে ধনঞ্জয় বৈরাগী। কোথা থেকে এলো এই ধনঞ্জয়, তার চমৎকার জবাব দিয়েছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—"বৌঠাকুরাণীর হাটে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাটকেই তার প্রথম আবির্ভাব। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞের অগ্নিশিখা থেকে যেমন পাঞ্চালীর উদ্ভব, ১৯০৫-০৮ সালের বঙ্গবিপ্লবের বহ্নি শিখা থেকেই তেমনি ধনঞ্জয় বৈরাগীর চারিত্র্যশক্তির উদ্ভব।"[২] আমরা যখন প্রায়শ্চিত্ত নাটকের পরবর্তী নাট্যরূপান্তর ইতিহাস আলোচনা করবো তখন দেখব এই নবাগত চরিত্র এই নাটকের বিবর্তন ইতিহাসের উপর কী রূপ সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করেছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর এই বিরাট প্রভাবের কারণ খানিকটা নাটকের অন্তর্গত প্রয়োজন, কিন্তু অনেকটাই জাতীয় জীবনের পটভূমিকার প্রেরণা। এই সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, "বঙ্গবিপ্লবের পরে ১৯০৯ সালে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে যে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে পাই, মহাত্মাপ্রবর্তিত সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ-বিপ্লবের পরে ১৯২২ সালে সেই ধনঞ্জয়কেই আবার পাই মুক্তধারা নাটকে ; সাত বৎসর পরে তাকে আবার পাই প্রায়শ্চিত্তের নবরূপ পরিত্রাণ নাটকে, মহাত্মাপ্রবর্তিত দ্বিতীয় প্রতিরোধ-আন্দোলনের ঠিক প্রাক্কালে (১৯২৯)। রবীন্দ্রনাথ বার বার করে ধনঞ্জয়কে দেশের সামনে তুলে ধরেছেন, কারণ তার চরিত্রের মধ্যেই তাঁর রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনার আদর্শ মূর্তি পরিগ্রহ করে প্রকাশ পেয়েছে।"[৩]

সে যাই হোক, বউঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের তুলনাকালে লক্ষ্য করি, নাটকের মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের উপস্থিতির ফলে উপন্যাসের ঘটনা পারিবারিক কেন্দ্রে যে ঐক্য লাভ করেছিল, সেই ঐক্য এখানে ব্যাহত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রজাদের সঙ্গে উদয়াদিত্যের যে স্নেহসৌহার্দ্যের সম্পর্ক তাই শুধু নাটকে নবাগত উপাদান নয়, ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গে নাটকে এসেছে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের সম্পূর্ণ নূতন উপকরণ। ধনঞ্জয় বৈরাগী এই প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্বদান করেছে। আর প্রতাপের মনে ধনঞ্জয়ের বিরোধ তো শুধু ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, সর্বজনীন আদর্শগত বিরোধ। "প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপাদিত্য কোনো বিশেষ দেশ বা কালের রাজা নয় ; প্রতাপ সর্বদেশ এবং সর্বকালের নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা প্রতাপেরই প্রতীক ; আর সে প্রতাপকে যে ভগবানের বলে প্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে অস্বীকার করে প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়, তারই নাম ধনঞ্জয় বৈরাগী। ধনঞ্জয়ও প্রতাপের মতোই সর্বকালীন ও সর্বদেশিক।"[৪] এই বৃহৎ সংঘর্ষের সঙ্গে পারিবারিক কাহিনীর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; উপন্যাসের যে ঐক্য ছিল পারিবারিক কেন্দ্রে, সেই ঐক্য এখানে একদিকে পারিবারিক কাহিনী ও অন্যদিকে প্রজাবিদ্রোহের কাহিনীর মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংঘাতের ব্যঞ্জনায় ভারসাম্য হারিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আত্মভোলা পিতৃব্য বসন্ত রায় বউঠাকুরাণীর হাটে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছিল, শ্রীসুকুমার সেনের মতে "উপন্যাসে কেন্দ্রীয় ভূমিকা বসন্ত রায়ের।"[৫] কেন্দ্রীয় না হোক, উপন্যাসে বসন্ত রায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর অনুপ্রবেশের ফলে এবং বৈরাগীর সঙ্গে চারিত্রিক কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্য থাকার দরুণ বসন্ত রায় চরিত্র প্রায়শ্চিত্তে রাহুগ্রস্ত। বসন্ত রায় নাটকে বহুলাংশে তার প্রয়োজন ও তাৎপর্য হারিয়ে উপন্যাসের উত্তরাধিকার হিসাবে নাটকে বসবাস করছে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটকে যে ঠাকুর্দা বা দাদা ঠাকুর চরিত্র মেলে, শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মতে এই "বসন্ত রায়কেই ঠাকুর্দা-চরিত্রের পূর্বরূপ বা অপরিণত রূপ বলিয়া আমার মনে হয়।"[৬]

73873
23 MAR 1981
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY

উপন্যাসে উদয়াদিত্যের অঙ্গুরী নিয়ে জাল দরখাস্ত তৈরি করিয়ে সেই দরখাস্তের ব্যাপারে উদয়কে জড়ানো হয়েছিল। কিন্তু নাটকে প্রজাদ্রোহের নূতন উপকরণ আসায় রবীন্দ্রনাথ প্রতাপকে উদয়ের প্রতি বিমুখ করার প্রয়োজনে সেই নূতন উপকরণকেই ব্যবহার করেছেন। প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখ প্রজারা এখানে উদয়াদিত্যকে রাজা করার জন্য দিল্লীতে দরখাস্ত প্রেরণ করেছে। সুতরাং জাল দরখাস্তের ষড়যন্ত্রের আর প্রয়োজন হয় নি। বিভা সম্বন্ধে রামমোহনের ভ্রান্তি উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছিল, নাটকে তার আভাস নেই, এবং উপন্যাসে বিভার যে ব্যর্থতা ও শূন্যতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সেই কালিমা নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সর্বব্যাপী আনন্দবাদে লুপ্ত হয়ে গেছে। এই অবলুপ্তির পিছনে কোন শিল্পগত হেতুবাদ পাওয়া যায় না। আর একটি পরিবর্তন ক্রিয়াপদগত। বউঠাকুরাণীর হাটের শুধু বর্ণনাংশ নয়, সংলাপও সাধু ক্রিয়াপদে লিখিত হয়েছিল ; কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সংলাপকে প্রায়শ্চিত্তে চলিত ক্রিয়ায় ঢেলে সাজিয়েছেন।

(খ) রাজর্ষি ঃ বিসর্জন

রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশকে বিসর্জন নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উপন্যাসের পরবর্তী অংশের সুজা ইত্যাদির কাহিনী নাটকে অনুপস্থিত।[৭] নাটকে সেই বিল্বনও নেই, যে বিল্বন রবীন্দ্রসাহিত্যে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে ব্রাত্য সেবাব্রতীর পূর্বসূরী। একটিমাত্র কেন্দ্রগত বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় নাটকটি এমন এক ঘনীভূত ঐক্য ও সংহতি লাভ করেছে যে বিস্মিত হতে হয়। উপন্যাসে এই ঐক্য ও সংহতি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই রাজর্ষির সূচনায় বলেছেন উপন্যাসের প্রেরণাস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ কাহিনীটির "আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবী সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হলো।"[৮] মাসিক পত্রের প্রয়োজনে রাজর্ষিতে যে অবৈধভাবে গল্প আকারে বেড়েছিল তাকে রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকে সাহিত্যের বৈধ আকার দিয়েছেন। ফলে 'আসল গল্পটা' অবান্তর বিষয়ের আড়ালে ঢাকা না পড়ে স্বদীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে এবং নাটকটি এমন মহৎ ঐক্যগুণ লাভ করেছে। এই ঐক্যের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মতো রঘুপতিকে দীর্ঘকালীন নির্বাসনে পাঠান নি। নির্বাসনদণ্ড পাওয়ার পর শ্রাবণের শেষ দুই দিন সময় চেয়ে নিয়েছে রঘুপতি এবং এই দুই দিনের সীমান্তের মধ্যে তীব্র গতিশীল ঘটনাবর্তকে রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করেছেন। শ্রাবণের শেষ রাত্রিতে জয়সিংহের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে চিরকালীন মুক্তিলাভ ও আত্ম-বলিদানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকে রঘুপতির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, যার জন্য জয়সিংহের আত্মবলি ছাড়াও দীর্ঘ সময় ও বিল্বনের প্রভাবের প্রয়োজন হয়েছিল রাজর্ষি উপন্যাসে। কিন্তু নাটকে শ্রাবণের শেষরাত্রির প্রচণ্ড আঘাতে সে পরিবর্তন নিমেষেই সমাধা হয়েছে। উপন্যাসে আষাঢ়ের কালরাত্রির পরেও রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু নাটকে শ্রাবণের শেষরাত্রির পরে বিরোধ আর বজায় থাকে নি। ধর্ম্মের নামে ভ্রাতৃহত্যা, দেবতার নামে পশুবলিদানের নৃশংসতা জয়সিংহ স্বীকার করতে পারে নি—এই দ্বন্দ্বে তার 'আশৈশব বিশ্বাসের মূল' নড়ে উঠেছে। 'জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর' মতো দেবীকেও সে মা বলে জানত, আজ যখন রঘুপতি সেই দেবীকে 'হৃদয়হীন শক্তি' বলে ব্যাখ্যা করেছে তখন জয়সিংহ সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন হয়েছে। মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে উপন্যাসের রঘুপতি ছোট হয়ে গিয়েছিল ; বিসর্জন নাটকের রঘুপতি, মিথ্যা ছলনা ও অভিনয়ের আশ্রয় নিয়ে হীন হয়েছে বটে, কিন্তু নাটকের অন্তিমে জয়সিংহের আত্মবলিদানের মর্মান্তিক বেদনায় পীড়িত হয়ে রঘুপতি তার অবলুপ্ত পূর্ব্ব মহিমা অনেক পরিমাণে ফিরে পেয়েছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশের সুজা প্রভৃতির কাহিনী যেমন নাটকে প্রশ্রয় পায় নি, তেমনি নাটকে হাসি নেই, কেদারেশ্বর নেই। উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র জয়সিংহ হয়েছে নাটকের নায়ক। বিসর্জনে নূতন চরিত্র চাঁদপাল, নয়ন রায় এবং এদের চেয়েও উল্লেখযোগ্য গুণবতী এবং অপর্ণা। গুণবতী ও অপর্ণা এই দুইটি নবাগত নারীচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে দুটি নূতন নাটকীয় উপকরণ। রঘুপতি নিজের ব্রাহ্মণত্বের অহংকার ও পৌরোহিত্যের অধিকার বজায় রাখার জন্য পূর্বপ্রথা পশুবলিদান অব্যাহত রাখতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সে কাজে লাগিয়েছে নিঃসন্তানা গুণবতীর সন্তানকামনাকে—পশুবলিদানের পুণ্য অর্জন করলে গুণবতী সন্তানবতী হবে এই লোভে গুণবতীকে সে প্রলুব্ধ করেছে। নারীসুলভ সংস্কারের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে সুতীব্র সন্তানলাভের কামনা। রাণী সন্তান-লোভে পুণ্য অর্জনের জন্য পশুবলিদান প্রথাকে সমর্থন করায় রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পক্ষে সংকল্প পালন করা আরো বেশী কঠিন হয়েছে। স্ত্রীর বিমুখতা সত্ত্বেও যখন সে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তখন তার চরিত্রমহিমা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাণীর অনুরোধ উপরোধে রাজা যতই অটল থেকেছে ততই গুণবতীর ধারণা হয়েছে সে নিঃসন্তানা বলে রাজার তার প্রতি এত অবজ্ঞা। রাজার সংকল্পে দৃঢ়তা তাই তাকে আরো বেশী সন্তানকামী করে তুলেছে এবং যতই সে সন্তানকামনা চরিতার্থ করতে চেয়েছে পশুবলিদান

প্রথার সাহায্যে, ততই রাজা ও রাণীর দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব বর্ধিত হয়েছে। গুণবতী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাই রাজা ও রাণীর এই সম্পর্ক এবং গুণবতীর বন্ধ্যাজীবনের বেদনার বিষয় নাটকে নূতন এসেছে। গুণবতী একটি প্রাণকণিকাকে দেহে ধারণ করার বিনিময়ে একশো মহিষ তিনশত ছাগের প্রাণনাশ করে পুণ্য অর্জন করতে উদ্যত, এই ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে যে নাটকীয় বিদ্রূপ আছে তাও স্বভাবতই উপন্যাসে ছিল না।

গুণবতীর প্রেম গোবিন্দমাণিক্যের সংকল্পের পথে, বিবেকসংগত সিদ্ধান্তের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আর অপর্ণার প্রেম জয়সিংহকে অনুপ্রাণিত করেছে সেই বিবেকসংগত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। অপর্ণা চরিত্রের সঙ্গে শুধু অপর্ণা আসে নি, এই নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে অপর্ণাই দেবী ত্রিপুরেশ্বরী। গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে যখন বিবেকবোধ অপর্ণার কথায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে তখন গোবিন্দমাণিক্যের বিশ্বাস হয়েছে এই সত্যবাণী কোন ভিখারিনী বালিকার নয়, এই বাণী স্বয়ং জগন্মাতার। জয়সিংহের মনে নূতন জিজ্ঞাসা জাগাতে সাহায্য করেছে অপর্ণার প্রতি জয়সিংহের নবজাগ্রত প্রেম। এই প্রেমও নূতন উপকরণ—উপন্যাসে স্বভাবতই এই ভাবাবেগ অনুপস্থিত ছিল। গুরুদেবের প্রতি আস্থা এবং অপর্ণার প্রতি ভালোবাসার বিরোধের সুযোগে রবীন্দ্রনাথ নাটকে দীর্ঘ দীর্ঘ শেকসপীরীয় স্বগতোক্তির মাধ্যমে জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়-আন্দোলিত মানসিক অবস্থা চিত্রিত করেছেন। জয়সিংহের প্রেম নাটকেই প্রথম রূপায়িত হয়েছে ; কিন্তু জয়সিংহের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যদিও নাটকেই প্রথম স্থান পায় নি, কিন্তু নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। রাজশক্তি এবং যাজকশক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক বিরোধের যে কথা উপন্যাসে অনতিস্পষ্ট ছিল, নাটকে তা অতি তীব্র স্পষ্টতায় নানা জনের সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে। রঘুপতি সব চেয়ে তীব্রভাবে বলেছে—

এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা, বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি···। (১।৪)

ধ্রুবকে হত্যার ব্যাপারে নক্ষত্র রায়ের সিংহাসন কামনার সঙ্গে বিসর্জন নাটকে আরো একটি নূতন উপাদান যুক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধ্রুবকে হত্যার চিন্তা নাটকে প্রথম এসেছে গুণবতীর মাথায়, উপন্যাসে এসেছে রঘুপতির মাথায়। উপন্যাসে জয়সিংহের আত্মবলির পরেও প্রতিহিংসাপরায়ণ রঘুপতির মতি পরিবর্তন হয় নি, সে গোবিন্দমাণিক্যকে আঘাত দেবার জন্য নক্ষত্র রায়কে ধ্রুবহত্যার পাপ-পরামর্শ দিয়েছে। উপন্যাসে রঘুপতি নক্ষত্রকে বলেছিল—'এই শিশুই তোমার শত্রু, তাহা জান? তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ—কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না?' মুকুট নিয়ে ধ্রুবর কাল-খেলা দেখে এবং রাজার হৃদয়ে ধ্রুবর স্নেহের আসন উপলব্ধি করে নাটকে রাণী গুণবতী ধ্রুবর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছে, কেননা এই সিংহাসন, রাজার হৃদয়ে এই স্নেহের আসন ছিল তারই অজাত সন্তানের জন্য বিধিনির্দিষ্ট। রাণী ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তাই নক্ষত্র রায়কে সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে ধ্রুবকে হত্যার জন্য উত্তেজিত করেছে। রঘুপতির পূর্বোদ্ধৃত উক্তি তাই এখানে গুণবতীর উক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

গুণবতী ॥ যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি?
নক্ষত্র ॥ সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।
গুণবতী ॥ ওই-যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।
নক্ষত্র ॥ তাই বটে! এতক্ষণে
বুঝিলাম সব—মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়। আমি বলি শুধু খেলা।
গুণবতী ॥ মুকুট লইয়া খেলা? বড়ো কাল-খেলা।
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা—নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলেনা। (৪।২)

উপন্যাসে ধ্রুবকে হত্যার চেষ্টা জয়সিংহের আত্মবলিদানের পরে ঘটেছে। নাটকের ঘটনা দুটির কালক্রম বিপরীতভাবে বিন্যাস করায় যে লাভ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জয়সিংহের আত্মত্যাগের পূর্বে ধ্রুবের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নাটকে রঘুপতির হৃদয়-পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছেন—যেখানে মন্দিরে হত্যার জন্য আনীত ঘুমন্ত ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুপতির মনে পড়ে গিয়েছে জয়সিংহের শৈশবের কথা। মন্দিরের সোপান-পাষাণের মতো কঠিন রঘুপতির ললাট এই প্রথম কোমল হলো। রাজার আদেশ পালনে নয়ন রায়ের অক্ষমতা সত্ত্বেও রাজার প্রতি নয়ন রায়ের সত্যকার আনুগত্য, এবং গভীর আনুগত্যের কথা সব সময় মুখে বলা সত্ত্বেও চাঁদপালের বিশ্বাসঘাতকতা—দুটি বৈপরীত্যময় নাটকীয় উপাদান নূতন চরিত্রদ্বয় আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে নূতন এসেছে।

কাহিনী-চরিত্র-বিষয়গত পরিবর্তন ছাড়া আছে ভাষাগত রূপান্তর এবং এই রূপান্তর কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এই ভাষাগত পরিবর্তন দুই জাতীয়। প্রথমত, যেখানে রাজর্ষির গদ্যসংলাপকে বিসর্জনেও গদ্য রাখা হয়েছে, যেমন প্রজাবৃন্দের কথোপকথনে অথবা প্রজাবৃন্দের সঙ্গে অন্য চরিত্রগুলির কথোপকথনে। দ্বিতীয়ত, যেখানে রাজর্ষির গদ্য-সংলাপকে বিসর্জনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই দুই জাতীয় রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য নিদর্শনের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। রাজর্ষির সংলাপে ক্রিয়াব্যবহার সম্বন্ধে আমরা একটি দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করি। বউঠাকুরাণীর হাটে সমস্ত সংলাপে সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু রাজর্ষিতে তথাকথিত ইতরলোকের কথাবার্তায় সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের বর্ণসংকরত্ব লক্ষিত হয়। যেমন, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে একবার প্রজাবৃন্দের মুখে পাই সাধু ক্রিয়ার ব্যবহার—'রাজার নিষেধ, আমরা কী করিব!' অন্যত্র সেই প্রজাদের অন্যতমের উক্তিতে পাই চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগ—'প্রভু, বলে দিন কী করলে মা ফিরে আসবেন।' অবশ্য রাজর্ষিতে শিষ্টজনের পারস্পরিক কথোপকথনে সব সময়েই প্রায় সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইতরজনের সঙ্গে কথাবার্তায় শিষ্টজনও অনেক সময় চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ফেলে। একই পরিচ্ছেদে রঘুপতি প্রজাদের তিরস্কার করেছে—'ঠাকুরন এ রাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকুরুনকে রাখতে পারলি কৈ? তিনি চলে গেছেন।' বিসর্জনে রূপান্তরকালে যেখানে রবীন্দ্রনাথ গদ্যভাষা সংলাপে অবলম্বন করেছেন সেখানে শিষ্ট-ইতরজন নির্বিশেষে সব গদ্যসংলাপেই চলিত ক্রিয়াপদ করা হয়েছে। প্রথমে গদ্য থেকে গদ্যসংলাপে রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দিই।

রাজর্ষি

রঘুপতি কহিলেন, "তোদের এই রাজা যখন এ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবেন, মাও তখন এই রাজ্যে পুনর্ব্বার পদার্পণ করিবেন।" (১৩)

বিসর্জন

রঘুপতি ॥ তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে। (৩।১)

রাজর্ষি

রঘুপতি মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তবে তোরা দেখিবি! আয়, আমার সঙ্গে আয়। অনেক দূর হতে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকুরুনকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস—চল্ একবার মন্দিরে চল।" (১৩)

বিসর্জন

রঘুপতি ॥ তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকুরুনকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ। (৩।১)

দুই ক্ষেত্রেই শুধু যে সাধু ক্রিয়াপদ বর্জন করে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে তাই নয়, অভিনয়ের প্রয়োজনে সংলাপের ভাষা সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জন করে হয়েছে ক্ষিপ্রগতি। এই সংলাপের স্রোতের পথে সামান্য উপলখণ্ডের বাধাও অপসারিত হয়েছে। মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়ে রঘুপতি যখন প্রজাবৃন্দকে উপন্যাসে এবং নাটকে দেবীপ্রতিমার পশ্চাদ্‌ভাগ দেখিয়েছে, যখন প্রজাবৃন্দের মুখ থেকে হাহাকার ও বিলাপধ্বনি উঠেছে, সেখানে জয়সিংহের সঙ্গে রঘুপতির যে কথোপকথন তা ক্রিয়াপদ পরিবর্তন ব্যতীত সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে উপন্যাস থেকে নাটকে গৃহীত হয়েছে।

যেখানে রাজর্ষির গদ্যসংলাপ বিসর্জনে পদ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে সংলাপের ভাষাগত আলোচনার ক্ষেত্রে সেই উদাহরণগুলি আরো বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। এই উদাহরণগুলি কাব্যনাট্য সম্বন্ধে এলিয়টের উক্তিকে সত্য প্রমাণিত করে—যে কথা গদ্যে প্রকাশ করা যায় সে কথা পদ্যের সাহায্যে আরো সুচারুরূপে প্রকাশ করা সম্ভব।* রাজর্ষির তৃতীয় পরিচ্ছেদ অবলম্বনে বিসর্জন নাটকের ১।২ দৃশ্য রচিত হয়েছে—গদ্যসংলাপের পদ্যে রূপান্তরের প্রথম নিদর্শন এখান থেকে গৃহীত হয়েছে।

রাজর্ষি

রাজা বলিলেন, "এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

চোন্তাই (পুরোহিত) রঘুপতি বলিলেন, আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি !"

রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্ত পান করিয়া আসতেছেন কী করিয়া ?"

রাজা কহিলেন, 'না, পান করেন নাই। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।" (৩)

বিসর্জন

গোবিন্দমাণিক্য ॥ মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়নরায় ॥ বলি নিষেধ ?

মন্ত্রী ॥ নিষেধ !

নক্ষত্ররায় ॥ তাই তো ! বলি নিষেধ !

রঘুপতি ॥ এ কি স্বপ্নে শুনি ?

গোবিন্দমাণিক্য ॥ স্বপ্ন নহে প্রভু। এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি ॥ এতদিন
সহিল কী করে ? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি ?

গোবিন্দমাণিক্য। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন। (১।২)

এই রূপান্তরে ভাষা সংহতি পেয়েছে এবং সংহতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অধিকতর ব্যঞ্জনা—'আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে' এই বাক্যাংশের সঙ্গে 'আজ জাগরণ' এই বাক্যাংশের তুলনা করলেই তা উপলব্ধি করা যায়। দুইটি পৃথক বাক্যকে একটি বাক্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে কিন্তু বক্তব্য অণুমাত্র হারায় নি। অথচ শৈথিল্যের দুর্বলতা ছন্দোবন্ধন সহজেই দূর করে দিয়েছে। ভাষার মধ্যে ছন্দোবদ্ধতার দরুণ এই ভাষা অভিনেতাকে স্বরক্ষেপে অধিকতর সামর্থ্য প্রকাশের সুযোগ দেয় ; শুধু তাই নয়, ছন্দোতরঙ্গের শোষণক্ষমতার ফলে এই সংলাপ একই সঙ্গে অনুভূতির উচ্চতম স্তরকে প্রকাশ করতে পারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিম্নতম সাধারণতম স্তরে নেমে আসতে পারে। নিতান্ত চলিত কথাকে সে অবহেলা করে না, আবার উচ্চতম আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাকে কাব্যিক বলে অগ্রাহ্য করে না। এখানে কাব্যের উচ্চতম অনুভূতি এবং জীবনের দীনতম কার্যকলাপ ও ভাষা একই সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে।

রাজর্ষি উপন্যাসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ একত্রিত করে বিসর্জন নাটকের ২।১ দৃশ্য রচিত হয়েছে। জয়সিংহের সম্মুখে রঘুপতি যখন নক্ষত্ররায়কে উত্তেজিত করছিল গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার জন্য তখন ভাইকে দিয়ে ভাই হত্যার এই চেষ্টায় বাধা দিয়েছে জয়সিংহ। তখন জয়সিংহের বিবেককে নিরস্ত করার জন্য এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছে রঘুপতি। পূর্বে আমরা ছোট ছোট সংলাপের কথা-চালাচালিকে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে পদ্যে রূপান্তরিত করেছেন দেখেছি ; নিম্নের উদাহরণে দেখবো আত্মপক্ষ সমর্থনে রাজর্ষিতে গদ্যে রঘুপতি যে দীর্ঘ উক্তি করেছে সেই উক্তিটিকে কী ভাবে রবীন্দ্রনাথ পদ্যে রূপান্তরিত করেছেন।

রাজর্ষি

রঘুপতি ॥ শোনো বৎস, তোমাকে তবে আর এক শিক্ষা দিই। পাপপুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে ? হত্যা যদি পাপ হয় তো সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ ? হত্যা তো প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনই কি বড়ো ? এই-সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবনমৃত্যু খেলা বৈ তো নয়, মহাশক্তির মায়া বৈ তো নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষকোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে—জগতের চতুর্দিক হইতে বীরশোণিতের স্রোত তাহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। (৬)

বিসর্জন

রঘুপতি ॥ তবে এসো বৎস, আর-এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহাহত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কী জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্তে দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—(২।১)

প্রথম রূপের তুলনায় দ্বিতীয় রূপ ভাষাগুণে এবং ভাষাগুণে বলেই যে আবেগাধিক্যে, শ্রেয়তর তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না—এই শ্রেয়তা স্বতঃপ্রকাশ। প্রথম তিন চরণে রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষির গদ্যরূপকে অনুসরণ করেছেন, অষ্টম ও নবম পংক্তিতে পুনরায় ফিরে গেছেন রাজর্ষির মূল উক্তিটিতে এবং বিশ্বের চতুর্দিক থেকে রক্তধারা মহামায়ার খর্পরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এই কথাও আমরা রাজর্ষির উক্তিটির মধ্যে পাই। কিন্তু 'এ জগৎ মহাহত্যাশালা' এই একটি বাক্যের মধ্যে সমস্ত উক্তির সার ধারণ করা, 'হত্যা অরণ্যের মাঝে' এই বাক্যাংশ থেকে আরম্ভ করে পুনঃ পুনঃ একই জাতীয় বাক্যাংশে সেই সার সত্যের নিদর্শন দেওয়া এবং সেই প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ 'হত্যা' কথাটির উপর বাক্যে ও উচ্চারণে আঘাত করে চরম থেকে চরমতর শীর্ষে নিয়ে যাওয়া এবং দুইটি আশ্চর্য উপমার মধ্যে দিয়ে এই দীর্ঘ উক্তির সমাপ্তি—এর কোন কিছুই রাজর্ষির ভাষার মধ্যে নেই। দ্বিতীয় উপমাটির আভাস যদিও রাজর্ষির সংলাপে ছিল, কিন্তু তার মধ্যে 'নিষ্পেষিত দ্রাক্ষার' ইমেজ ছিল না, যার জন্য উপমাটি মহত্ত্ব ও অনন্যতা লাভ করেছে। হত্যার বিমূর্তভাবের সঙ্গে বিদ্যুৎগামী আক্রমণোদ্যত ব্যাঘ্রের তুলনাও মহোপমাজাতীয়। অর্থাৎ রাজর্ষির এই উক্তিটির রূপান্তর শুধু গদ্য রূপান্তর নয়, 'sea-change' বা জন্মান্তর, যেন সাধারণ স্তর বা দান্তে-কথিত 'হীন স্বপ্নের' জগৎ থেকে 'সমুন্নত স্বপ্নে'র জগতে উত্তরণ।

(গ) প্রজাপতির নির্বন্ধ ঃ চিরকুমার সভা

প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভা প্রহসন-নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। উপন্যাসাকারে প্রথম প্রকাশসময়ে উপন্যাসটির নাম কিন্তু চিরকুমার সভাই ছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের নূতন নামকরণ করেন প্রজাপতির নির্বন্ধ। প্রজাপতির নির্বন্ধকে যখন তিনি নাট্যরূপ দিলেন তখন পূর্বে ব্যবহৃত নামটি—চিরকুমার সভা—নাট্যরূপের জন্য গ্রহণ করলেন। এই প্রসঙ্গে নাচঘরে ১৩ই ভাদ্র ১৩৩১ তারিখে প্রকাশিত খবর উল্লেখযোগ্য—"মনোমোহন নাট্যমন্দিরে শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনা

চিরকুমার সভার অভিনয় হবে। সকলেই জানেন, চিরকুমার সভা এতদিন আধা-উপন্যাস ও আধা-নাটকের আকারে বর্তমান ছিল। কিন্তু শিশিরকুমারের অভিনয়ের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাকে পুরাদস্তুর নাটকে রূপান্তরিত করেছেন এবং সেজন্যে চিরকুমার সভার মধ্যে যে আবশ্যকমত পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে সে কথা বলা বাহুল্য।[১০] সংলাপবহুল বর্ণনাবিরল এই 'আধা-উপন্যাস ও আধা-নাটককে' 'পুরাদস্তুর নাটকে' রূপান্তরিত করা কোন শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল না। নাটকের মতো করেই সংলাপের পর সংলাপ সাজিয়ে উপন্যাসটি লিখিত হয়েছিল, উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি আসলে নাটকের দৃশ্যের মতোই বিভক্ত। তাছাড়া নাটকের মতো করেই প্রস্থান-প্রবেশ প্রভৃতির সাহায্যে পাত্র-পাত্রীর আচরণ নির্দেশ করা হয়েছে। উপন্যাসের যে যে পরিচ্ছেদের ঘটনা একই স্থানে ঘটেছে এবং যেগুলির মধ্যে গল্পগত পরম্পরা বিদ্যমান, সেগুলিকে একত্র করে সাধারণত নাটকের এক-একটি দৃশ্য রচিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য উপন্যাসের একটিমাত্র পরিচ্ছেদ অবলম্বনে নাটকের একটি দৃশ্য লিখিত হয়েছে। সংলাপের প্রায় কোন পরিবর্তন হয় নি। এমন কি নাট্যনির্দেশের প্রয়োজনীয় বর্ণনাগুলি পর্যন্ত উপন্যাস থেকে নাটকে অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে, যেমন, 'নির্মলা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া পালের নৌকার মতো নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।' গানের ওস্তাদ গুরুদাস নাটকে একমাত্র নবাগত প্রসঙ্গ, যদিও তার উল্লেখ উপন্যাসেও ছিল। দুই-একটি গান কোথাও কোথাও নাটকে নূতন যুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ নূতন গান নারীকণ্ঠে গীত হবার জন্য যুক্ত—নৃপ ও নীরবালার কণ্ঠে। উপন্যাসের শেষে রসিক বলেছে, 'এইবারে নাটক শেষ হলো।' এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটি নাটকেও অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান। এই উক্তিটি থেকে বোঝা যায় শুধু পাঠক কেন, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীও উপলব্ধি করেছিল এই উপন্যাসটি প্রহসনধর্মী 'আধা-নাটক' এবং তাই সহজে এই 'আধা-নাটককে' 'পুরাদস্তুর নাটকে' পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ বহিরঙ্গে 'আধা-নাটক' হলেও অন্তরঙ্গে উপন্যাসই বটে। কারণ এখানে ঘটনা ঘটনা হিসাবে দেখানো হয় নি, বর্ণনায় দেখানো হয়েছে। তার সংলাপ চতুর বটে, কিন্তু সব সময় নাটকীয় গুণে গুণান্বিত নয়। উপন্যাসের মতোই কাহিনীর গতি মন্থর। 'আধা-নাটককে' পুরো নাটক করা গেছে বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে উপন্যাসের উত্তরাধিকার রয়ে গিয়ে তার নাটকীয়তার ক্ষতি করেছে। এই সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "মূলে গল্পাকারে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই নাট্যরূপের মধ্যেও গল্প-শিল্পের প্রকৃতি রহিয়া গিয়াছে ; ইহাকে অভিনয়যোগ্যতা দিতে গিয়াও কবি সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হন নাই। উপন্যাসের ঘটনার মৌলিক মন্থরতা, ঔপন্যাসিক সংলাপের দীর্ঘায়ত আতিশয্য নাটকের অনিবার্য গতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। আবার উপন্যাসে যে-সব বর্ণনা কবির ব্যক্তিগত অভিমত আকারে পাঠককে আনন্দ দান করে—সেগুলি নাটকের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে মুদ্রিত থাকিলেও পাত্র-পাত্রীর মুখে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা হয় নাই—ফলে নাটকের শ্রোতার পক্ষে তাহা অবান্তর ও অলব্ধ সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু নহে।"[১১]

১ প্রায়শ্চিত্তের বিজ্ঞাপন, রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ (প, ব, স) পৃঃ ২৪৩

২ ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন, ১৯৬২, পৃঃ ১৭৮

৩ তদেব, পৃঃ ১৮৯

৪ তদেব, পৃঃ ১৮৯

৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)—সুকুমার সেন, ১৩৬৮, পৃঃ ২৫৯

৬ রবীন্দ্রসাহিত্য বিচিত্রা—প্রমথনাথ বিশী, ১৩৭৪, পৃঃ ৩৫৪

৭ রাজর্ষি উপন্যাসের শেষাংশ ও দালিয়া গল্প মিলিয়ে শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ 'সিনেমার উপযোগী একটি নাটকের' খসড়া করেন। রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (১ম খণ্ড)—পুলিনবিহারী সেন, পৃঃ ১৯২-১৯৫ দ্রষ্টব্য।

৮ রাজর্ষির সূচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ (প, ব, স,) পৃঃ ১১৪

৯ A Dialogue on Dramatic Poetry—Eliot, (Selected Essay, 1963, P 46)

১০ অমল মিত্রের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত, সাপ্তাহিক দেশ, বর্ষ ৩২, সংখ্যা ১৫

১১ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ)—প্রমথনাথ বিশী, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৫১